গবেষণার সারসংক্ষেপ (Abstract)

১.গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম (Title of the Research work) ঃ

রায়মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল ও ষষ্ঠী মঙ্গল ঃ উদ্ভব, বিশেষত্ব এবং চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

২. বিষয় বিবরণী ঃ (Statement of the problem/area of the subject) ঃ

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা সুদূর পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রবাহিত। এই চারশত বৎসর ব্যাপি মঙ্গলকাব্যগুলি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য বিভিন্ন কবির হাতে তার উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র লাভ করেছে, যা কাব্যগুলিকে অমরত্ব দান করেছে। তুর্কী শাসনে বিপর্যস্ত অসহায় বাঙালীর জীবনে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এবং দৈবানুগ্রহে পরম নির্ভরশীলতা-এই কাব্যের গুরুত্ব বিশেষত্বকে প্রধান অপ্রধান মঙ্গল কাব্য বলে চিহ্নিত করেছে। প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি হল— 'মনসা মঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' এবং 'অন্নদামঙ্গল'। এছাড়া অপ্রধান মঙ্গল কাব্যগুলি হল— 'কালিকামঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল' 'ষষ্ঠীমঙ্গল', গঙ্গামঙ্গল', 'সূর্যমঙ্গল', 'পঞ্চানন মঙ্গল', 'সারদা মঙ্গল', 'কমলামঙ্গল' এবং 'অনাদি মঙ্গল' ইত্যাদি।

ভয় ভীতি থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্যের জন্ম- তার প্রমাণ 'মনসাঙ্গল কাব্য'। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত সমাজে মনসা খুব সহজে পূজা প্রচার করলেও, উচ্চবিত্ত সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে বিলম্বিত হল। সমাজের প্রধান স্তর বণিকদের কাছে পূজা না পেলে তাঁর মহিমা বৃদ্ধি পাবে না। বণিক সমাজের প্রধান চাঁদ সদাগর তিনি পরম শৈব। তিনি কোন কারণেই একচক্ষু নারী দেবতার পূজা করবেন না বলে স্বধর্মে অটল রইলেন। মনসার কোপানলে চাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং তার পরিবারে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত। একদিকে মনসার অত্যাচার, অপরদিকে সনকার আর্ত্তনাদ, বেহুলার সতীত্ব কাঠ গড়ায়। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মাপের কাব্য রচনা করলেন। মনসা, চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা, ধন্বন্তরী ওঝা, ঝালু-মালু, ধনা-মনা, কাজী, টেটন, আপুডোম ইত্যাদি উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের চরিত্র রচনায় কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের বিশেষত্বে মনসামঙ্গল কাব্য— মঙ্গলকাব্য ধারার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই তিনজন কবি ছাড়াও এ কাব্য রচনায় আরো অনেক কবি আছে। কাব্যগুলির উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করেছে নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সিদ্ধ হস্তের লেখনীতে।

ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য হল 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'। কবি কঙ্কণ

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের মূলত দুটি কাহিনী— ক. কালকেতু ফুল্লরা কাহিনী, খ. ধনপতি শ্রীপতি কাহিনী। কালকেতু ও ফুল্লরার ব্যাধ জীবনযাত্রা, তাদের জীবনে চণ্ডীর আগমণ, কলিঙ্গ রাজ ও কালকেতুর যুদ্ধ, পশুগণের ক্রন্দন, ফুল্লরার বারমাস্যা ইত্যাদি ঘটনা ক্রমে এ কাব্য অনবদ্য। কালকেতু ও ফুল্লরা স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর ও পুত্রবধূ ছায়া। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু, ফুল্লরা, মুরারীশীল, ভাড়ুদত্ত ইত্যাদি চরিত্রগুলি রচনায় কবির অসাধারণ দার্শনিকতায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হয়ে উঠেছে। বণিক খণ্ডে ধনপতি ও শ্রীপতির চণ্ডীদর্শন, চণ্ডীর কৃপালাভ — এর মধ্যে দেখা গেল প্রথমে কালকেতু ফুল্লরার কাছ থেকে পূজা আদায়। পরবর্তীতে ধনপতি ও শ্রীপতির পূজা আদায়। আসলে নিম্নবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের কাছে চণ্ডী পূজা আদায়ে সমর্থ হয়েছেন। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর দার্শনিকতা, সামাজিকতা, পৌরাণিকতা এবং রাজনৈতিক চেতনাবোধ, সর্বোপরি বাস্তব অভিজ্ঞতায় এ কাব্য মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়ে উঠেছে। এ কাব্যের শব্দ চয়ন, ছন্দ, আলংকারিকতা এবং প্রবাদ প্রবচনে মধ্যযুগের সর্বোৎকৃষ্ট মানের হয়ে উঠেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনার্য প্রভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনী— ক. রাজা হরিশচন্দ্রের গল্প, খ. লাউসেনের আখ্যান। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে দেখা যায় ধর্মের কৃপায় অপুত্রক হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লাভ। এই অংশ অলৌকিক মহিমায় পরিপূর্ণ। লাউসেন কাহিনীতে - ধর্মের কৃপায় অসাধ্য সাধন, অলৌকিক মহিমায় এ কাহিনী পরিপূর্ণ। লাউসেনের বীরত্ব, সাহসিকতা, ধর্ম ঠাকুরের কৃপালাভ-এ কাব্যের মূল কাহিনী যা রাঢ়বঙ্গে ব্যাপক হারে প্রচলিত। এ কাব্যের দেবতা প্রস্তর খণ্ডে, পাদুকা চিহ্ন, কূর্মাকৃতি, কখনো ডিম্বাকৃতির মাধ্যমে পূজা পেয়ে থাকে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে- রাজা হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, লাউসেন, রঞ্জাবতী, কালুডোম, নয়ানী, সুরিক্ষা, কলিঙ্গা, কানাড়া ইত্যাদি চরিত্রের সমাহার। চরিত্র রচনায় কবি ঘনরাম বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেখিয়েছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরামের কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র সৃষ্টি, নির্মাণ কৌশল, শব্দ চয়ন এবং আলংকারিক সৌন্দর্য বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি সম্পদে পরিণত হয়েছে। ড. সুকুমার সেন 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যকে 'রাঢ়ের মহাকাব্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্ম ঠাকুরকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা' বলে মনে করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিমান কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' যুগসন্ধির শ্রেষ্ঠ কাব্য। অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি খণ্ড ক. অন্নদামঙ্গল, খ. অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ, গ. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর। তিনটি খণ্ডের ঘটনা, চরিত্রসৃষ্টি দেব মাহাত্ম্য প্রচারে এ কাব্য অনবদ্য। অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি খণ্ডের মধ্যে ঘটনাগত সংযোগ আছে বলে, তিনখানিকে একত্রে অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভূক্ত করে প্রকাশ করেছে কবি। এ কাব্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক পরিমণ্ডলের আবর্তে অন্নদামঙ্গল পুষ্ট। বাস্তব সামাজিক

প্রেক্ষাপটে কবিত্বের স্পর্শে এ কাব্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। কবির শব্দচয়ন, কাহিনী গ্রন্থন, ছন্দ-অলংকার এবং প্রবাদ প্রবচন প্রয়োগে এ কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গণ্ডী অতিক্রম করে মানব জাতির অনাদি কালের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে রচিত এই সব মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্যগুলি শক্তিমান কবিদের সাহচর্যের ফলে আজ পর্যন্ত এগুলির গ্রহণযোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এবং সেই কারণেই এগুলি হয়ে উঠেছে বহু মানুষের বহু দৃষ্টি ভঙ্গিতে চর্চার বিষয়। অথচ বহু অপ্রধান মঙ্গল কাব্য যার কথা আমরা শুরুতে বলেছি, সেগুলি চিরকালই থেকে গেছে অন্তরালে, তাহলে কি অপ্রধান বলেই এগুলি অন্তরালবর্তী? আর নাকি অন্তরালবর্তী বলেই থেকে গেছে অপ্রধান হয়ে? এই উত্তরআধুনিক যুগে আমরা আজ এই প্রশ্নের সম্মুখীন। কেননা উত্তরআধুনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক - 'ফিরে চল মাটির টানে' আর কি প্রধান, কি অপ্রধান সব মঙ্গল কাব্যই তো মাটি ঘেষা। মঙ্গলকাব্যের পাঠক হিসাবে, গবেষক হিসাবে, আমাদের তাই কৌতূহল অষ্টাদশ শতকের তিনটি অপ্রধান মঙ্গলকাব্য— ক. রায়মঙ্গল কাব্য, খ. শীতলা মঙ্গল কাব্য, গ. ষষ্ঠী মঙ্গলকাব্য নিয়ে, কেননা বঙ্গভূমির সঙ্গে সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের আর এই বঙ্গভূমিতেই যথেষ্ট ভাবে এই তিনটি কাব্যের দেবী এবং কাব্যগুলি চর্চিত। বিশেষত রায়মঙ্গল কাব্য, শীতলা মঙ্গল কাব্য, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য এই তিনটি আজ একুশ শতকের বিভিন্ন এলাকার অন্ত্যজ সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। তাই আমরা আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে নির্ধারণ করেছি এই তিনটি অপ্রধান মঙ্গল কাব্যকে।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য হিসাবে প্রথমে 'রায়মঙ্গল কাব্য' পাঠে দেখা যায়— প্রাগার্য সমাজে ব্যাঘ্রপূজা হত। এমনকি মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার সেখানে শিবের বস্ত্র ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রায়মঙ্গল কাব্যে বিশেষ অভিনবত্ব হল ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়কে নিয়ে, এ কাব্যের মাহাত্ম্য কবি কৃষ্ণরাম দাস সুন্দর ভাবে কাব্যমধ্যে উপাস্থাপন করেছেন। পরবর্তীকালে এই একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ খাতের সাহেব 'বোন বিবী জহুরী নামা' রচনা করেন। পুষ্প দত্ত, বাউল্যা রতাই, দক্ষিণরায়, গাজীসাহেব, রাজা সুরথ ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে এ কাব্যের কাহিনী অসাধারণ। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাদাবন এলাকায় দক্ষিণরায়ের পূজার্চনা ব্যাপক হারে চলছে। সুন্দরবন, মেদিনীপুর, উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগণ্ণা ইত্যাদি এলাকায় পৌষ সংক্রান্তিতে ঘটা করে পূজার্চনা হয়। কাব্য মধ্যে ট্রাজেডি, রোমান্সের উপাদান চোখে পড়ার মতো। ছোট বালক দুখের জীবন কথা কবি অসাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন। সর্বোপরি এ কাব্যে, হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দক্ষিণরায় অসাম্প্রাদয়িক দেবতা এবং এই কাব্য সাম্প্রদায়িকতার বেড়া জাল ছিন্ন করে অসাম্প্রদায়িক কাব্য হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনিভাবে শীতলা মঙ্গল কাব্য তৎকালীন সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

পরবর্তীকালে শীতলা মঙ্গল কাব্য রচনায় দ্বিজ নিত্যানন্দ, কৃষ্ণরাম দাস এবং কবি বল্লভ প্রমুখ কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। এদের বেশির ভাগ পুঁথি দুষ্প্রাপ্য। দ্বিজ নিত্যানন্দ বিরচিত 'শীতলা মঙ্গল' কাব্যের কাহিনীর চারটি পালা– ক. গৌকুল পালা, খ. বিরাট পালা, গ. চন্দ্রকেতুর পালা, ঘ. রঘুনাথ দত্তের পালা। এই পালাগুলি পর্যায় ক্রমিক ভাগে গ্রথিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, জঙ্গমতা মানব জীবনের রোগব্যাধি– বসন্ত, কলেরা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শীতলার কাছে আত্মসমর্পণ করে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষেরা। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত সামাজের সাধারণ মানুষ এই কাব্যের কাজী চরিত্রের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সমগ্র শীতলা মঙ্গল কাব্যের, মা শীতলা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজিত হয়ে আসছে। এবং শীতলা যাত্রা করে ধর্মপ্রাণ মানুষ আত্মতুষ্টি পেতে সমর্থ হয়েছে।

মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর মতই লৌকিক দেবী। মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী যেভাবে পুরাণে প্রবেশ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সেই উপায়ে ষষ্ঠী দেবীও কয়েকখানি অর্বাচীন পুরাণে স্থান লাভ করেছে। শিশু মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের, বিশেষত নিম্নবিত্ত সমাজের শিশুরা বিভিন্ন কুসংস্কার, অলৌকিক বিষয় আশয় এর উপর ভর করে মৃত্যু সন্মুখীন হয়। ষষ্ঠীদেবী শিশুর রক্ষয়িত্রী। তার চরিত্রের মধ্যে কল্যাণ গুণই প্রধান। ষষ্ঠীর পূজার দ্বারা শিশুর মৃত্যু আশঙ্কা দূর হয়। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠী পূজা সারা বাংলায় প্রচলিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীর বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠী পূজার বর্ণনা পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি পল্লীতে ষষ্ঠীতলা নামক একটি স্থান থাকে। ষষ্ঠীতলাতে ষষ্ঠী দেবী থাকে বলে মানুষের বিশ্বাস। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। নিম্নবিত্ত সমাজে দেবী খুব সহজে পূজা প্রচার করলেও, উচ্চবিত্ত সমাজের প্রসার লাভ করতে দেবীকে সপ্তগ্রামের রাজার স্মরণাপন্ন হতে হয়। যা সুদূর অষ্টাদশ শতক থেকে আজ একুশ শতকেও পুরোমাত্রায় বহমান।

৩. প্রস্তাবিত বিষয়ে এযাবৎ গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (A brief overview of literary work already done in area of the proposal) ঃ

এ যাবৎকাল পর্যন্ত প্রধান কাব্যগুলি সম্পর্কে বহুগবেষণা যেমন হয়েছে, তেমনি লিখিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু অপ্রধান মঙ্গলকাব্য, বিশেষত আমাদের আলোচ্য এই তিনটি কাব্য নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ– অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখরা খুব সামন্য পরিচয় দিয়েছেন মূলত কাব্যের বিষয় এবং কবি

সম্পর্কে। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি সম্পর্কে যে ভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, অপ্রধান মঙ্গলকাব্য নিয়ে তেমন গভীর আলোচনা করেননি। বিশেষত আমাদের আলোচিত এই তিনটি মঙ্গলকাব্য– রায়মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য এই সব প্রখ্যাত ইতিহাসকারদের দৃষ্টি লাভে ধন্য হয় নি। আর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' নামে যে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তাতে শুধু মাত্র রায়মঙ্গল ও ষষ্ঠী মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা ভূমিকাংশে আছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সব অল্প স্বল্প আলোচনাকে সামনে রেখেই আমাদের গবেষণার আশ্রয় মূলত মূল গ্রন্থগুলি, যা আমরা পেয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে।

৪. গবেষণা প্রকল্পের রূপ রেখা (Research Hypothesis) ঃ

আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণায় এগিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছি।

৫. অধ্যায় বিভাজন (Chapterisation) ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সপ্তদশ–অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষিতে আলোচ্য তিনটি কাব্যের উদ্ভব এবং তার আঞ্চলিক প্রেক্ষিত

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বিশেষত্ব

চতুর্থ অধ্যায় ঃ দ্বিজ নিত্যানন্দের শীতলা মঙ্গল কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বিশেষত্ব

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কৃষ্ণরাম দাসের ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বিশেষত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাব্য এবং তার অপ্রধান হওয়ার কারণ

সপ্তম অধ্যায় ঃ একুশ শতকে এই কাব্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

উপসংহার

প্রথম অধ্যায় ঃ

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ঔরাঙ্গজেবের শাসনাধীনে এল। ঔরাঙ্গজেবের পঞ্চাশ বছর বিস্তৃত

রাজত্বকালে বাংলা অর্থনৈতিক শোষণে জীর্ণ হয়ে পড়ল। বাংলা থেকে কোটি কোটি টাকা সম্রাটের রাজকোষে পাঠাতেন, শুধু তাই নয় করভারে গোটা দেশ ভীষণ পীড়িত ছিল। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিল। তার উপরে ছিল বর্গি-মগ্-পর্তুগীজদের হানাদারী। মোঘল সম্রাট, সুবেদারদের অনেকেই ছিল অসচ্চরিত্র, অর্থলোলুপ, বিলাসী, কামুক। এর প্রভাব অমাত্যবর্গের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। একটা দুষিত পৌরুষহীন, লালসা-শৈথিল্য সারাদেশ প্রকট হয়ে উঠল। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে এই অবস্থা। অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদকুলি খাঁ বা আলিবর্দি যোগ্য শাসক হলেও, দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি। মুর্শিদকুলি খাঁর হিন্দু বিদ্বেষ। এমনকি হিন্দু জমিদার ও প্রজাদের পীড়ন করে। এবং অর্থসংগ্রহের ফলে সারা দেশে হাহাকার করে তুলেছিল।

আলিবর্দির সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। বর্গী-মারাঠা অশ্বারোহী সেনাবাহিনী ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে অত্যাচার চালিয়ে, লুট্তরাজ চালিয়ে, নারীর উপর ঘৃণ্য অত্যাচার চালিয়ে এবং নবাবের কাছ থেকে বলপূর্বক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ কর আদায় করে, দেশটাকে শ্মশান করে তুলেছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় গঙ্গার পশ্চিমতীর পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়েছে। শস্য ক্ষেত্র ও জনপদ শ্মশান হয়ে উঠেছে। সারা দেশে নিদারুণ অন্নাভাব। আলিবর্দি বর্গীদের বাধা দেওয়ার পরিবর্তে প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় সচেষ্ট হলেন। এরই মধ্যে শাসক ঔরাঙ্গজেবের মৃত্যু এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় সুবেদার, আমাত্যদের হীন ষড়যন্ত্র, স্বার্থ চিন্তা, অঁরাজকতা দেখা দিল।

১৭০৭ সাল থেকে ১৭৩১ পর্যন্ত যে সব মোঘল শাসক ময়ূরসিংহাসনে বসেছিল। তারা দেশকে রক্ষা করা বা সমৃদ্ধশালী, সম্পদশালী করার ক্ষমতা দেখতে পারেনি। সুযোগ সন্ধানী ব্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় কর্তৃত্ব ভার কায়েম করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছর বাংলার অর্থ প্রভূত পরিমাণে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছে। দারিদ্র, অনাচার, অরাজকতা, চরমে পৌঁচেছে। দেশের তাঁত শিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্য কোম্পানী ও তার রাজকর্মচারীদের স্বার্থ বিপর্যস্ত হতে লাগল। উৎকোচ ও পীড়ন তুঙ্গে উঠল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তার দুরাবস্থা চরম আকার ধারণ করল। মোট কথা সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় সমাপ্তি পর্যন্ত বাঙালীর জীবনে ছিল অব্যবস্থা ও সংকট। অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এবং সামাজিক ব্যাভিচার চরমে উঠেছিল।

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে একমাত্র ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কবি হিসাবে স্বীকৃত হল। এছাড়া আর যে সমস্ত মঙ্গল কাব্য লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই পুরাতনের অনুসরণ বলে মনে করেন - ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন বিষয়বস্তু ও চরিত্র রূপায়ণে

এ যুগের মঙ্গলকাব্য গুলিকে দীন বলে মনে হয়। কারণ যুগটা মঙ্গলকাব্যের উপযোগী ছিল না। সে কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ ভেঙে পড়ল। মুসলমান আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধতা ক্ষুন্ন করল। নিষ্ঠাহীন নাগরিক জীবনের কালিমা সমগ্র জাতির ভালে কলঙ্ক লেপন করল। এই সময়ের মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাতন বিশ্বাসের স্থলে হাস্য পরিহাস, রঙ্গব্যঙ্গ কৃত্রিম বচন বিন্যাস হয়েছে জনগনের চিত্তাকর্ষী।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষিতে আলোচ্য তিনটি কাব্যের উদ্ভব এবং তার আঞ্চলিক প্রেক্ষিত

আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট সাহিত্য রচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই বঙ্গের আঞ্চলিক প্রেক্ষিত উঠে আসবে। তার কারণ নদী মাত্রিকা বনাঞ্চল আবৃত বিশাল জনপদ ভূমির মানুষের কাছে 'রায়মঙ্গল' কাব্যের দেবতা দক্ষিণরায় পূজিত হয়। বিশাল এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং দক্ষিণারায়ের পূজার্চনা একে অপরের পরিপূরক বললে অত্যুক্তি হয় না। বনাঞ্চল আবৃত বিশাল জনপদ ভূমির নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন, বিশেষ তিথিতে বিস্তৃর্ণ বনাঞ্চল এলাকায় শ্রদ্ধার সাথে সুদূর অষ্টাদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত ধুমধাম করে পূজার্চনা করে থাকে।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে কবি অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে রায়মঙ্গলের চরিত্রগুলি রচনা করেন। দক্ষিণারায়, কালুরায়, সাজঙ্গুলে, দুখে প্রভৃতি চরিত্র রচনায় সিদ্ধ হস্তের পরিচয় দেন। রায়মঙ্গলে ঘটনার সাথে মিল আছে এমন একটি গ্রন্থ হল– মোহাম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত 'বোন বিবী জহুরা নামা'। এছাড়া রায়মঙ্গলের পুঁথি দুষ্প্রাপ্য। যাই হোক রায়মঙ্গলের ঘটনা, চরিত্র, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সবই নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভিত্তি করে রচিত। পৌষসংক্রান্তির দিন সুন্দরবন জঙ্গলের মধ্যেই রায়মঙ্গল কাব্য পাঠ করে অত্যন্ত জাকজমক করে বনবিবি পূজা হয়ে থাকে। এই কাব্য আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বললে ভুল হয় না।

শীতলামঙ্গল কাব্যের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বেদনা দায়ক। কবি দ্বিজ নিত্যানন্দ তাঁর শীতলা মঙ্গলকাব্যে দেবী শীতলার ভয় ভীতির পাশাপাশি বসন্ত, কলেরা, মহামারী প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করেন এবং মানুষের উপর প্রয়োগ করেন। বিশেষ করে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় এই রোগ বেশি আকারে দেখা দিল। রোগের হাত থেকে মুক্তির উপায় দেবীর পূজার্চনা শ্রদ্ধা সহকারে করতে হবে। এখানে বেশ কয়েকটি পালা - গোকুল পালা,

বিরাট পালা, জাগরনী পালা ইত্যাদি পালাগুলির সমস্ত চরিত্র রাজা, প্রজা, সবাই শীতলা দেবীর পূজা বাধ্যতামূলক করতে হয়েছে। আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশি চোখে পড়ে। পূর্ববঙ্গ, উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর এবং নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের আবাসস্থলে শীতলা মঙ্গলের আঞ্চলিক প্রেক্ষিত। এমনকি চরিত্রগুলিও আঞ্চলিকতার মোড়কে আবৃত। প্রান্তিক মানুষের উপাস্য দেবী শীতলা। সুদুর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বিজ নিত্যানন্দের শীতলা মঙ্গল গ্রন্থ পাঠ সহকারে এবং এই গ্রন্থের গীতিনাট্য সহকারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন পূজার্চনা করে চলেছে।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য তিনটি খণ্ডে সুস্পষ্ট। প্রথমাংশে রাণীর সহিত সখী নীলাবতীর সাক্ষাৎ। দ্বিতীয়াংশে সায়বেনের গল্প। তৃতীয়াংশে ষষ্ঠী পূজার বিধান বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচনার বহুপূর্ব থেকে ষষ্ঠী পূজা প্রচলি ছিল। কবি কৃষ্ণরাম দাস তা অত্যন্ত যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করেন। আর গ্রন্থের মধ্যে দেবী ষষ্ঠী তার পূজা প্রচারের জন্য নিম্নবিত্ত মানুষকেই প্রথম বেছে নিলেন। এখানে শিশুবাচ্চা চুরির প্রসঙ্গ, কালো বিড়ালের প্রসঙ্গ, নীলাবতীর রাজদ্বারে প্রবেশের প্রসঙ্গ এবং সর্বপরি দেবী ষষ্ঠী ছলে বলে কৌশলে তার পূজা আদায় করে নিলেন। কিন্তু যাদের উপর দেবী প্রভাব বিস্তার করলেন তারা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রান্তিক মানুষ। সে মানুষের আবাস স্থল পূর্ব-বাংলা, পশ্চিম-বাংলার উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সুদুর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত পূজার্চনা, পুঁথি পাঠ চলে আসছে। দেবী ষষ্ঠীর পূজা কেবলমাত্র মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাইহোক সাম্প্রতিককালে এই পূজা প্রচুর পরিমাণে চলে আসছে এবং আজও চলছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বিশেষত্ব

কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল কাব্য সমগ্র বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির একটি জীর্ণকায় পুঁথি পাওয়া গেছে। বর্তমান বাংলাদেশে নিম্নবর্ণের মানুষজনেরা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সাথে ঘটনার কিছু মিল রেখে মোহাম্মদ খাতের সাহেব 'বোন বিবী জহুরা নামা' গ্রন্থটি রচনা করেন। তবে কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল গ্রন্থটির রচনা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। এখানে শব্দ প্রয়োগে বাংলা, আরবি, ফার্সি শব্দের ব্যবহার আছে। গ্রন্থের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে দক্ষিণরায়, সাজঙ্গুলে, কালুরায়, গাজী সাহেব প্রত্যেকটি চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ। কলিঙ্গ নগরের সদাগর সারা

বন ঘুরেও মধু, মোম, কাঠ সংগ্রহ করতে পারল না। অবসন্ন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে দেবী স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে তাদের আশা পূরণ করেন।

গ্রন্থটির মধ্যে ব্যাঘ্রের উপদ্রব, দুখের জীবনের ট্রজেডি, দক্ষিণবায় ও বড় গাজীর যুদ্ধ বৃত্তান্ত অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয়েছে। নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন সুন্দরবন, বাংলাদেশ, উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করেন এবং তাদের জীবন-জীবিকা সবই সুন্দরবন নির্ভর। সে কারণে ব্যাঘ্রের দেবতাকে সন্তুষ্টি না করলে তারা ধনে প্রাণে মারা যাবে। কাব্যের চুয়ান্নটি আখ্যানে সীমাবদ্ধ করেছেন কবি। প্রত্যেক আখ্যানের শেষে কবির নামোল্লেখের পাশাপাশি কবি দক্ষিণরায় কে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। দক্ষিণরায়ের পূজার্চনা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ করে থাকেন। কবির স্বকীয়তা হল একাব্য অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মানবিকতায় ভরপুর কবি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মেল বন্ধন ঘটাত তাঁর রায়মঙ্গলকাব্যে বিশেষত্ব দেখিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

দ্বিজ নিত্যানন্দ বিরচিত শীতলা মঙ্গলকাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বিশেষত্ব

শীতলামঙ্গল কাব্য রচনায় দ্বিজ নিত্যান্দ, কবি কৃষ্ণরাম দাস এবং বল্লভ এর নাম পাওয়া যায়। তবে দ্বিজ নিত্যানন্দের পুঁথি ছাড়া বাকীগুলো দুষ্প্রাপ্য। দ্বিজ নিত্যানন্দ তাঁর শীতলামঙ্গল কাব্য দেবীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ঘটনাগুলিকে পর্যায় ক্রমিকভাবে সুগ্রথিত করেছে। এই কাব্যের বিশেষত্ব হল দেবী শীতলা ভয়-ভীতি, রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে পূজা প্রচার লাভ করেছে। রাজা প্রজা সবাই দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। দেবীর বাহন গাধা এবং দেবীর অস্ত্র ঝাটা। যে কোন প্রকারে দেবী তার পূজা আদায়ের কৌশল রচনা করেন। কখনো যুবতী, কখনো বা বৃদ্ধা সেজে দেবী রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত সবাই দেবীর দয়ার পাত্র। শীতলামঙ্গলের চরিত্রগুলি— বিরাট রাজা, কাজী সাহেব, মদন দাস, হৃষীকেশ সাধু প্রত্যেকটি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও মহিমা ও মানবিকতা স্থাপনে কবি বিশেষ স্বকীয়তা দেখিয়েছে।

অলৌকিক, লৌকিক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচনায় কবির বিশেষত্ব চোখে পড়ার মতো। প্রত্যেকটি পালায় ঘটনাই আকর্ষণের কেন্দ্রীয় বিন্দু এছাড়া কবির সহজ সরল শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন চোখে পড়ার মতো। কবি কোথাও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছে, কোথাও বা কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। যাইহোক সুদুর অষ্টাদশ শতক থেকে একবিংশ শতক পর্যন্ত সমহিমায় বিরাজিত। এখন আমাদের গবেষণার বিষয় শুধু কেবল রোগ-

ব্যাধি বিস্তার করে এ কাব্য এতদিন চলতে পারে? না কবির কোন বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে; যা কাব্যটিকে কয়েক শতাব্দি পরেও মানুষের কাছে অমর করে রেখেছে। গবেষণায় গ্রন্থের বিষয় বিশ্লেষণ, আঙ্গিকগত বিশেষত্ব আমাদের চর্চার বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

কৃষ্ণরাম দাসের ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বিশেষত্ব

ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচয়িতা হিসাবে কৃষ্ণরাম, রুদ্ররাম, শঙ্কর এই তিনজন কবির নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের পুঁথিটি পাওয়া যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। বাকী লেখকদের কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরাম বিরচিত ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ড সপ্ত গ্রামের রাণীর সহিত সখী নীলাবতীর সাক্ষাৎ। দ্বিতীয়াংশে সায়বেনের গল্প এবং তৃতীয়াংশে ষষ্ঠী পূজার বিধান বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠীমঙ্গলের লৌকিক ও অলৌকিক বিষয় স্থাপনে কবি অদ্ভুত কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। কালো বিড়ালের প্রসঙ্গ এমনি আকর্ষণীয়। নীলাবতীর প্রসঙ্গটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ - যে কিনা অতি সহজে রাণীর মন জয় করতে পারে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিষয় আশয় কবি দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ষষ্ঠী দেবী সুদূর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্বমহিমায় বিরাজিত।

ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনায় কবির শব্দচয়ন, বাক্যগঠন অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে রচনা করেছেন। কাব্যটি রচনায় কবি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগে বিশেষ স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। কবির কাব্যগুণ, বৈচিত্র্র সৃষ্টি, ঘটনা উপস্থাপনে বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। আমাদের গবেষণার অত্যন্ত জরুরী বিষয় হল- এই কাব্যটি অষ্টাদশ শতক থেকে একবিংশ শতক পর্যন্ত স্বমহিমায় বিরাজিত কেন? কেন এটি অপ্রধান মঙ্গলকাব্য? এই গ্রন্থের বিষয় ও আঙ্গিকগত বিশেষত্ব আমাদের গবেষণার বিষয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

প্রধান মঙ্গল কাব্যগুলির প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাব্য এবং তার অপ্রধান হওয়ার কারণ

তুর্কী শাসনে বিপর্যস্ত অসহায় বাঙালী জীবনে যে বিশেষ ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল তারই সাহিত্যিক প্রকাশ 'মঙ্গলকাব্য'। এই মঙ্গলকাব্যগুলি পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে-অষ্টাদশ

শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত। প্রধান মঙ্গল কাব্য হিসাবে– 'মনসা মঙ্গল', চণ্ডীমঙ্গল', ধর্মমঙ্গল' এবং অন্নদামঙ্গল কাব্য। এদের গুরুত্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে একুশ শতক পর্যন্ত মানুষের আরাধনায় বিদ্যমান। কিন্তু এই কাব্যগুলি শুধু কি দেবদেবীরা ভয়-ভীতি দেখিয়ে আজপর্যন্ত সমাজে তাদের আবেদন জাগিয়ে রেখেছে?

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যে নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দ্বিজ মাধব এবং কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যেমন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঠিক তেমনি ভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যে রূপরাম চক্রবর্তী এবং ঘনরাম চক্রবর্তী বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন কবি। সব শেষে বলা যায় যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্র তার সৃষ্ট অন্নদামঙ্গল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। এই প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি রচনায় প্রচুর কবির নাম পাওয়া গেলেও মূলত খ্যাতি সম্পন্ন কবিদের সৃজনশীল সৃষ্টি প্রতিভায় তাদের অভিনবত্বে পাঠক, সমালোচক, বিশিষ্টজন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাদের অকৃত্রিম রচনাকে প্রধান মঙ্গল কাব্য হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছে, যা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্দ্বিধায় কৃতিত্বের দাবি রাখে।

তাহলে, উপরোক্ত প্রধান মঙ্গল কাব্যগুলি সমালোচকদের মতে যে যে কারণে প্রধান হয়ে উঠেছে, সেই বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে আমরা বিচার করব আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্য গুলিকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা আমাদের আলোচ্য তিনখানি মঙ্গলকাব্যে উদ্ভব বিশেষত্ব আলোচনা করেছি। এখানে আমরা সেই উদ্ভব ও বিশেষত্বকে সামনে রেখে এগুলির কাব্যগুণ, সামাজিক আঞ্চলিক প্রেক্ষিত প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব ঠিক কী কারণে এগুলি অপ্রধান। নাকি, শুধু লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে বলেই অপ্রধান।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

একুশ শতকে এই কাব্যগুলি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

বাংলা দেশ হল আর্দ্রভূমির দেশ। এখানে ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির, এবং সব জায়গাতেই সাপের উপদ্রব। সুতরাং মনসার বন্দনা করলে সর্পাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কালির উপাসনা করলে সমস্ত বিপদ-আপদ কেটে যায়, দক্ষিণরায়ের পূজায় শীর্ণি দিলে ভক্তকে আর বাঘে কুমিরে প্রাণ হারাতে হয় না। মা শীতলার পূজা করলে রোগ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ষষ্ঠী পূজা করলে নবজাত সন্তানের মৃত্যু ভয় থাকে না। এ বিশ্বাস আমাদের বঙ্গবাসীর মনে বদ্ধমূল। আধ্যাত্মিক এই পরিমণ্ডল অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ একুশ শতাব্দীতেও বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন

শ্রদ্ধার সাথে এই পূজার্চনা করে চলেছে। পূজা চলাকালীন এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলি স্ব স্ব পূজায় শ্রদ্ধার সাথে ভক্তি সহকারে পুরোহিত পুঁথি পাঠ করে থাকে।

তিন অপ্রধান মঙ্গল কাব্য হল - ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলা মঙ্গল এবং রায়মঙ্গল। সুদূর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে উপাস্য কাব্যের দেবদেবীরা। বলাবাহুল্য যদিও এদের কৌলিন্য প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির সমসাময়িক। এই কাব্যত্রয়ের সব কবির পুঁথি আজ পর্যন্ত উদ্ধার হল না। আমরা যাঁদের বইগুলো পাঠ করলাম তাঁরা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত বলে দাবি করেছেন। সে কারণে ভাবের ঘোরে রচিত কাব্যগুলি জনমানসে ব্যপক প্রভাব ফেলেছে। তা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বনাঞ্চল এলাকার নিম্নবিত্ত জনজীবনে যুগ যুগ ধরে উপাসনা করে চলেছে। আগামী দিনগুলিতেও ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক।

'শীতলামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল', কাব্যত্রয় আমাদের জনজীবনে এদের প্রভাব অনস্বীকার্য। আমরা এই কাব্যত্রয়ের দেবদেবী যে ভূমিতে, যে সম্প্রদায়ের কাছে উপাস্য- আমরা সেই ভূমির ভূমিপুত্র বলে গর্ববোধ করি। কারণ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের, প্রজন্ম পরম্পরাগত ভাবে এই ভূমিতে লালিত পালিত। একুশ শতকে সে কারণে আমাদের প্রশ্ন সুদূর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকার জনমানুষ এই সমস্ত দেবদেবীদের বিশেষ বিশেষ তিথিতে, ঘটা করে পূজার্চনা করে এবং নাট্য গীতির মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবাবেগ এখনও বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর, উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই তিন দেব দেবীর প্রচুর মন্দির চোখে পড়বে। এই কাব্যগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নাট্যগীতিধর্মী যাত্রাদল পূজার্চনার পাশাপাশি রীতিমত যাত্রা মঞ্চস্থিত করে নিয়ে চলেছে। যা একুশ শতকে ভাবনার অবকাশ থাকে। সে কারণে কল্পনার রাজ্যে পাড়ি না দিয়ে মর্ত্য পৃথিবীর মানুষের উপাস্য বিষয়কে আমাদের কৌতূহল ও গবেষণার বিষয় হিসাবে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

উপসংহার ঃ

ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং রায়মঙ্গল কালের সীমা অতিক্রম করে আনাদিকালের সাহিত্য সম্পদ হিসাবে বাংলা সাহিত্যের স্থান করে নিতে পেরেছে। আবার কবিদের রসবোধ সংযম চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে এই নির্দিষ্ট কবিত্রয়ের, কাব্যত্রয় আমাদের কৌতুহলকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। আর সেই কৌতুহল থেকে আমাদের যে শুরু, সেই যাত্রার সমাপ্তিতে এসে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো অপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও এগুলির গুরুত্ব কোথায়?